রোদেলা
দিনের
গল্প

বই	**সোনেলা দিনের গল্প**
লেখক	মুহাম্মদ টিম
ভাষা সম্পাদনা	হাসান শুয়াইব ও অন্যান্য
বানান সমন্বয়	মাকামে মাহমুদ ও অন্যান্য
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা	*মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম*

রোদেলা দিনের গল্প

লেখিকাবৃন্দ

সানজিদা সিদ্দিকা কথা, আনিকা তুবা, হামিদা মুবাশ্বেরা, তাহনিয়া ইসলাম খান,
আফিফা আবেদিন সাওদা, শারিন সফি অদ্রিতা, নুসরাত জাহান মুন

লেখকবৃন্দ

মাহদি হাসান, আরিফুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার,
আলী আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ আল মাসউদ, মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ,
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ, মাহমুদ আহমাদ, ইবনে আদহাম

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

রোদেলা দিনের গল্প

মুহাম্মদ টিম

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com -এ**

মূল্য : BD ৳ ২৩৫, UK $ 8, UK £ 7

RODELA DINER GOLPO

Writer : Muhammad Team

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, Underground, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95377-2-4

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

কিছু গল্প শুধু গল্প নয়। কিছু কাহিনি শুধু ইতিহাস নয়। কিছু গল্প থাকে জানার, শেখার, শেখাবার। কিছু গল্প থাকে ঈমানকে সজ্জিত করার। কিছু গল্প থাকে আমলকে সুসংহত করার। কিছু গল্প থাকে আখলাককে শেকড় থেকে শিখরে পৌঁছে দেবার। কিছু গল্প থাকে ধৈর্যকে অবিচল রাখার।

জীবনঘনিষ্ঠ এমন কিছু গল্পের শিরোনামই 'রোদেলা দিনের গল্প'। যা আপনার ঈমান, আমল, সবর, শোকর, সালাত, সাওম; মোটকথা, ইসলামের নানা বিষয়কে করবে উজ্জীবিত-সুসংহত। আপনাকে পৌঁছে দেবে শেকড় থেকে শিখরে। গোলাম থেকে আল্লাহর প্রিয়দের কাতারে...

এ বইয়ে যা কিছু ভালো; সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা অসুন্দর তা আমাদের সীমাবদ্ধতা থেকে। পাঠক সেভাবেই দেখবেন আশা করি।

আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০১ জুন, ২০২১

সূচিপত্র

সবর ও পুরস্কার—সানজিদা সিদ্দিকা কথা ১১

সুখতত্ত্ব—মাহদি হাসান.. ১৯

খাদ—আনিকা তুবা.. ২৭

সত্য : শুনলাম এবং মেনে নিলাম—আরিফুল ইসলাম ৩৬
তাকদিরে বিশ্বাসের স্বরূপ

এটা কি কোনো গোলকধাঁধা?—হামিদা মুবাশ্বেরা.............................. ৪১
শরিয়া আইনে ধর্ষকের বিচার ও

সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও জবাব—মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৫১

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শান্তি কি—তাহনিয়া ইসলাম খান ৬২

আটশ টাকার নাগেটস—আলী আবদুল্লাহ.. ৬৫

সাধারণ মানুষদের ইলম অর্জনের পথ ও পদ্ধতি—আবদুল্লাহ আল মাসউদ......... ৭১

গুচ্ছ গুচ্ছ গল্প কিংবা অগল্প—মুনশি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ ৭৪

অজান্তে—আফিফা আবেদিন সাওদা ৮০

মোহরানা স্ত্রীর অধিকার, স্বামীর করুণা নয়—তাহনিয়া ইসলাম খান................ ৮৫

তুমি শক্ত হয়ে জমে থেকো—আনিকা তুবা.. ৮৯

তাওবা: অতীত মোছার ইরেজার—মাহদি হাসান.................................. ৯৩

তাঁর মতো আর কেউ নেই—শারিন সফি অদ্রিতা ৯৯

নতুন করে পাওয়া—সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ...................................... ১০৩

সাহায্যকারী : সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য?—তাহনিয়া ইসলাম খান ১১৫

আত্মকথন—নুসরাত জাহান মুন ১২২
আমার কি আসলেই সময় নেই?—শারিন সফি অদ্রিতা ১৩১
তোমাদের জন্য প্রতিদান—মাহমুদ আহমাদ.. ১৩৪
তারাই হলো সফলকাম—ইবনে আদহাম ১৪২
আমাদের জন্য সমুদ্র কেন দুভাগ হয় না?—শারিন সফি অদ্রিতা.................... ১৪৯
অন্ধকার থেকে আলোতে!—শারিন সফি অদ্রিতা ১৫২

রোদেলা দিনের গল্প

সবর ও পুরস্কার

সানজিদা সিদ্দিকা কথা

আমি মিলি। আমি যখন মালয়েশিয়াতে আসি তখন রাশেদের সাথে একরুমের একটা ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিলাম। রাশেদ তখন মাস্টার্স করছে। কঠিন জীবন। প্রতিটা রিঙ্গিত[১] খরচ করতে হয় হিসেব করে। এরপরেও মাসের শেষ পাঁচ দিন আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যেত। তখন রাশেদ আর আমি রোজা রাখতাম।। মা ফোন দিয়ে বলত,

'কী রে মিলি কেমন আছিস? আজকে তোর কথা এত মনে পড়ছে, তোর সব ভাইবোন বাসায়, তুই নাই। তোর পছন্দের সরষে ইলিশ রেঁধেছিলাম। আচ্ছা তুই কী খেলি রে, মা?'

'এই তো মা খেলাম। আচ্ছা তোমার বিড়ালের খবর কী? বাচ্চাগুলো ঝগড়া করে নাকি এখনো?'

'আর বলিস না। সাদা রঙের একেবারে ছোট বাচ্চাটা এত অভিমানী হয়েছে না। সারাক্ষণ পেছন পেছন লেগে থাকে। বাথরুম থেকে বের হয়েও দেখি সামনে বসে লেজ নাড়ছে। এ আবার মহারানি ভিক্টোরিয়া। এর ভাইবোনদের সাথে খাবে না। আলাদা করে মাছ সেদ্ধ করে দিতে হবে।'

আমার সোজা সরল মা আমার খাওয়ার খবর থেকে বাচ্চা বিড়ালের খাবারের বর্ণনায় ব্যস্ত হয়ে যেত। এভাবে কথার মোড় ঘুরিয়ে লুকানোর চেষ্টা করতাম আমাদের প্রকৃত অবস্থা। হয়তো কোনোদিন বাবা ডায়বেটিস নিয়ে কী কী অনর্থ করল সেই নিয়ে পড়ত। আমি মনে মনে হাফ ছেড়ে বাঁচতাম।

---

[১] মালয়েশিয়ান মুদ্রার নাম।

এখন দিন বদলেছে। রাশেদ বেশ ভালো একটা চাকরি করে। এখন কী খাব এই চিন্তা করে রোজা রাখা লাগে না। বরং সোমবার আর বৃহস্পতিবারের রোজার ইফতারে আমি ইউটিউব ঘেটেঁ ঘেটেঁ নতুন নতুন আইটেম রাঁধবার চেষ্টা করি।

আমার মেঝো বোন লিলি। ছোটবেলায় আমরা ছয় ভাইবোন মিলে ওকে ডাকতাম লুলালি। লুলা প্লাস লিলি, মিলে লুলালি। এই নামের পেছনের ইতিহাস অনেকটা এইরকম—

বড়পা ছোটবেলা থেকেই একটু মোটাসোটা ছিল, একবার ঘুমের মধ্যে কাত হয়ে লিলির গায়ে উঠে যায় আর লিলি নাকি হাতে ব্যথা পায়। ওর ভাষ্যমতে মারাত্মক ব্যথা। সারাদিন লিলি তার ডান হাত পাড়ার লুলা ফকিরের মতো করে ঝুলিয়ে রেখে একটু পর পর জপছিল, বড়পা আমাকে লুলা বানায় দিসে মা। আমিও কি লুলা ফকির হব? ওর ভণিতা অবশ্য বেশিক্ষণ টেকেনি। রাতে বাবা চকলেট নিয়ে বাড়ি ফেরার পরে কোনো এক বিচিত্র উপায়ে ওর লুলা হাত এমনিতেই ভালো হয়ে গেল। আর সেই থেকে আমার ভাই তৈমুর ওর নাম দিলো লুলালি। যদিও বড় হয়ে, নাম নিয়ে তামাশা করা উচিত না। বিষয়টির নিন্দনীয় দিক জানার পর বাদ দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ।

সে যাই হোক, প্রায় সাড়ে তিন বছর পর দেশে ফিরব। এর কারণ হলো লিলিপার ছেলে হবে। ছেলের নামও ঠিকঠাক হয়ে গেছে। শুধু আমার যাওয়ার অপেক্ষা।

রাশেদকে বলতেই রাজি হয়ে গেল। ওর খুশির মাত্রাটাও অন্যরকম। এই তো, গত এক সপ্তাহ ধরে অফিস শেষে আমাকে নিয়ে বিভিন্ন মার্কেটে ঘুরে লিলিপার ছেলের জন্য রাজ্যের জিনিসপত্র কিনেছে। মাঝেমধ্যে যদিও আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে, 'আমার বাচ্চাকাচ্চা হচ্ছে না এই কথা ভেবে আমি দুঃখী মেয়ে হয়ে যাচ্ছি কিনা।' ওর চোখের ভাষা বুঝতে পেরে আমি ওর দিকে তাকিয়ে একান ওকান একটা হাসি দিই। ইংরেজিতে এই হাসির নাম হচ্ছে গ্রিন। আমার হাসি দেখেই রাশেদ বিব্রতভঙ্গিতে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়।

- হ্যালো, লিলিপু!

- কী রে?

- তোর পেটের ভেতর আমার যে ছেলে আছে ও কেমন আছে সেটা বল। তোর খোঁজ নেওয়ার দিন শেষ, দ্যা ইন্ড।

- ভালোই তো আছে মনে হয়। তোর ছেলে দুনিয়াতে ল্যান্ড করলেই ইচ্ছামতো ধোলাই দেওয়া হবে। পেটের ভেতর নব্বই মিনিটের ম্যারাথন ফুটবল খেলে। এইগুলা কি ধরনের কথা?

- এহ্। তোকে ধোলাই দিয়ে আবার লুলালি করে দেওয়া হবে। আর শোন, যে জন্য ফোন দিয়েছি। আমার ছেলের সব কেনাকাটা আমি করে ফেলেছি। ওর জন্য যাতে আর কেউ কিছু না কিনে। একটা সুতাও না। আর দুলাভাইকে বলে দিয়ো ছেলের মা কোনোকিছু কিনতে বারণ করেছে।

- কী যে পাগলামি করিস না মিলি। তোর এত খরুচে স্বভাব কোথা থেকে হলো রে? অপচয় করিস না বললাম।

- আপা রাখি। তিনদিন পরে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ, আর ভেতরের জনকে বলে দিস আমি আসার আগে যাতে ল্যান্ড না করে। আরও বলে দিস, সবার আগে ওর মা ওকে কোলে নেবে।

- কবে বড় হবিরে মিলি তুই?

- কক্ষনো না। রাখছি।

-✷--✷--✷-

এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছি প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। আমাদের সব লাগেজ চলে এসেছে, শুধু আহনাফের জন্য যেটা আলাদা করা ছিল, সেটা মিসিং। রাগ এবং অসহায় নিয়ে মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। রাশেদ খবর নিয়ে এলো, লাগেজ এলে ওরা নাকি আমাদের ফোনে খবর দেবে। রাশেদ তৈমুরের ফোন নম্বর দিয়ে এসেছে।

আমার প্রায় কাঁদো কাঁদো দশা। এত মানুষের মাঝে না থাকলে হয়তো কেঁদেই ফেলতাম। ভাগ্যিস আমার চোখ ছাড়া কিচ্ছু দেখা যায় না।

বাইরে তৈমুর একটা টিয়া রঙের উবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কী রে তৈ? এতদিন পরে আমাকে দেখলি, মুখখানা ভূতের মতো বানিয়ে রেখেছিস কেন?

ভূতের মুখ কেমন থাকে?

জানি না। ফ্রম হোয়ার ইউ হ্যাভ ম্যানেজড দিস লেমন ইয়েলো কালার'স কার? (ড্রাইভার কে কাটানোর জন্য কিঞ্চিৎ আংরেজি বলাই যায়) আমি নিশ্চিত তুই ইচ্ছা করে এই কাজ করেছিস।

সবাই কে নিজের মতো ভাবিস না তো।

কী ব্যাপার তৈ? কিছু তো একটা হয়েছে। ঝেড়ে কাশ।

রাশেদও মনে হয় বুঝতে পারল কিছু একটা গন্ডগোল।

শালা সাহেব। জলদি বলে ফেলো তো দেখি।

আমাকে সবাই বলতে নিষেধ করেছিল। বাসায় গিয়ে রেস্ট নিয়ে পরে শুনলে হয় না?

আমি প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, এখুনি বলবি। এখুনি।

লিলিপুর হঠাৎ ব্লিডিং শুরু হয়েছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। বাকিরা সবাই হাসপাতালে লিলিপুর সাথে। ডাক্তার নাকি বলেছে প্লাসেন্টা ছিঁড়ে গেছে। একটু কমপ্লিকেইটেড হতে পারে।

তুই পারলি এই ব্যাপারটা এতক্ষণ ধরে লুকিয়ে রাখতে। কীভাবে পারলি। ড্রাইভার কে এখুনি বলো গাড়ি ঘুরাতে। আমি সোজা হসপিটাল যাব। বাড়ি যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

রাশেদও বলে উঠল, 'তৈমুর, গাড়ি হাসপাতালে নিতে বল।'

***

আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁছুলাম ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটা ছুঁইছুঁই। সব ভাইবোন এইখানে। মা আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জাপটে ধরল। বড়পা বলে উঠল,

বাড়ি গিয়ে কাপড় বদলেই তো আসতে পারতি। ভাবিস না, জলদিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার কেন জানি কিছু বলতে ইচ্ছা হলো না। আমরা সব কটা ভাইবোন একটু কেমন জানি। কেউই ভেতরে কী হচ্ছে সেটা ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারি না। যে যার মতো কপাল কুঁচকে বসে থাকি। কেউ কিছু বললেও খিটখিট করতে থাকি। খালি বড়পা মায়ের মতো। সবকিছু সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে। রিমি, সিমিকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা নিজেদের অস্তিত্ব লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে। বাবাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কোনো আড়ালে গিয়ে কান্না গিলবার চেষ্টা করছে এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

ডিউটি ডক্টর এসে দুলাভাইকে ডেস্কে ডেকে নিয়ে গেল। রাশেদও পেছন পেছন গেল। ডক্টর সিজার করে ফেলবে। ব্লিডিং বেশি। কিন্তু তার আগে বন্ড সই করতে হবে।

আপনাদের মধ্যে কার রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ। অপারেশন এর সময় রক্ত লাগবে।

নার্স এসে মুখস্থ প্রশ্নের উত্তরের মতো এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল। নার্সগুলো মনে হয় প্রতিদিন শত শত এইরকম ঘটনা দেখতে দেখতে রোবটিক হয়ে গেছে। আচ্ছা উনার যদি একটা বোন থাকত, তখনও কি এভাবেই বলত। কে জানে বলতো হয়ত।

তৈমুর আর বড় দুলাভাই দুজনের রক্তের গ্রুপই বি পজিটিভ। দুইজনই এগিয়ে গেল।

বড় একটা কালো পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে। সাথে এগারোটা কালো পিঁপড়া। এরা একই সাথে বড় একটা সাঁকো পেরোচ্ছে। বাঁশের চিকন সাকো। বড় কালো পিঁপড়া চিৎকার করে বলছে,

'সাবধান পিঁপড়ার দল। দেখে শুনে পা ফেলো। নিচে গিরি খাদ। পড়ে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু।' সারিবেঁধে পিঁপড়ার দল যাচ্ছে। কী অদ্ভুত। এদের সাথে আমিও বাঁশের সাঁকো পেরোচ্ছি। তাল হারিয়ে পড়তে পড়তে আবার রওনা হলাম। বড় কালো পিঁপড়া ধমক দিয়ে বলল,

'মিলি তুমি খুব অস্থির। বারবার বলছি সাবধানে চলো। এখন পড়ে গেলে কী হতো?'

আমি মিহি গলা করে জবাব দিলাম, ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন রানি পিঁপড়া। ঠিক তখনই লম্বা সারির দুই নম্বর ছোট্ট পিঁপড়াটি গিরিখাদে পড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কী আশ্চর্য নিচের পানি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কী ভয়ংকর। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি চোখের সামনে থেকে সব মুছে ফেলতে।

এই মিলি এই। ওঠ। এই।

আমি চমকে উঠে বসলাম। কীভাবে এখানে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি! কী আশ্চর্য! আর কী ভয়ংকর স্বপ্ন!

কীরে ঘুম হলো? অপারেশন হয়ে গেছে। দুই ব্যাগ রক্ত লেগেছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ লিলি স্ট্যাবল আছে।

বড়পার কথায় বাস্তবে ফিরলাম আমি।

আর আহনাফ?

আমি আতঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

ওর ওজনটা বেশ কম রে। এমনিতে ভালোই আছে। কিন্তু তিনদিন ইনকিউবিটরে রাখবে। শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছিল।

ও আচ্ছা।

বাড়ি চল মিলি। রিমি আর তৈমুর এখানে থাকবে। আর তোর দুলাভাইও থাকবে। লিলির জন্য খাবারও পাঠাতে হবে। হাসপাতালের খাবারের যে দশা। যাচ্ছেতাই। সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে। হু।

-☀--☀--☀-

আহনাফ আর লিলিপুকে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম ঠিক আটদিন পরে। দুইজনই বেশ সুস্থ আছে। আর কী অবাক কাণ্ড, আহনাফটা দেখতে একেবারে আমার মতো হয়েছে। ওকে ছেড়ে এক মাস পরে চলে যেতে হবে এই ব্যাপারটা আমি পারতপক্ষে মাথায় আনতে চাই না। কী দরকার।

আহনাফের জন্য রাশেদকে দিয়ে আমি জরুরি কিছু কাপড় এনেছি। আর কাউকে কিনতে দিইনি। কাঁথা মা আগেই সেলাই করে রেখেছিল। লাগেজ পাওয়া গেলে আর চিন্তার কিছু থাকবে না। ।

আমাদের বাকি দুই বোনের বাচ্চা-কাচ্চা এখনো হয়নি। তাই আহনাফের আদর আকাশচুম্বী। বাবার আদিখ্যেতা দেখে মা প্রায়ই টিপ্পনী কাটে, 'নিজের বাচ্চাদের তো জীবনে কোলে নিতে দেখি নাই।' রিমি সিমিও প্রতিদিন কলেজ ফাঁকির ছুতো খুঁজে বেড়ায়। এরা জমজ হলেও এদের চেহারায় কোনো মিল নেই। আর সারাদিন ঝগড়াও করে। ইদানীং ঝগড়ার প্রধান বিষয় হলো আহনাফ। কে কোলে নেবে সেই নিয়ে কেউ কারও মুখ দেখে না।

-☀--☀--☀-

আঠারো দিন পরে বিমানবন্দর থেকে তৈমুরের মোবাইলে ফোন এলো, লাগেজ পাওয়া গেছে। সাথে সাথেই রাশেদ আর তৈমুর বের হয়ে গেল লাগেজ আনতে।

আমি তখন গোসলে ঢুকে গায়ে দুই তিন মগ পানি ঢেলেছি। হঠাৎ লিলিপুর চিৎকার। লিলিরে......

সেই ডাক ভয়ার্ত কিছুর ইঙ্গিত বহন করছিল। হারানোর আভাস ঝরছিল সেই আওয়াজে। এটা আঁচ করতে পারার পর আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা কিছু একটা নেমে গেল।

আমার মিলি আপা ছোট্ট আহনাফকে হাতে নিয়ে পাথরের মতো বসে আছে। বাসার কেউ ওর কাছে ভিড়তে সাহস পাচ্ছে না।

আহনাফ হঠাৎ করে একটু কেঁপে উঠেছিল আর মুখে একটু ফেনা। এরপর ছোট্ট জীবন থেকে বিদায়।

এরপরের কিছুদিন আমাদের বাসার অবস্থা কেমন ছিল সেটা বলবার মতো ভাষা আল্লাহ্ আমাকে দেন নাই। কবরস্থান কি আমাদের বাড়ির চেয়েও শুনসান হয়? এরচেয়েও বেশি ভয়ংকর হয়?

-☀-☀-☀-

আমার ফিরবার সময় হয়ে গেছে। বাড়ির সবাই খুব স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে আমার সামনে। কিন্তু যে ভার নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি সেই ভার কি হিমালয়ের চেয়ে কম? আমার জানা নেই।

ঠিক আগের রাতে লিলিপু আমার রুমে ঢুকে আমার মাথায় হাত রাখল। কী স্নিগ্ধ লাগছে ওকে। কী মায়াবতী একটা মুখ।

-আপা।

- শোন মিলি। তোকে একটা গল্প বলি। আহনাফ যখন পেটে আমি প্রায়ই আল্লাহকে বলতাম, আমার এই ছেলেটাকে তুমি ইহকাল আর পরকাল দুইকালেই বিজয়ী করে দিয়ো। ওকে তুমি আমার জান্নাতে যাবার উসিলা করে দিয়ো। আমার আল্লাহ্ আমার দুআ কবুল করেছেন। দেখতে পাচ্ছিস? এর চেয়ে কম সময়ে আমার রব আর কীভাবে দুআ কবুল করবেন, একটু ভেবে দেখত। দুঃখ পাসনে। ও কত্ত ভালো আছে জানিস?

আমার কাছে হঠাৎ এই জগৎসংসার সব বৃথা মনে হচ্ছে। আমি অবাক হয়ে লিলিপুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেহেশতি মেয়েরা কী এমনই হয়। কী অপার্থিব লাগছে ওকে। আমার মনে হচ্ছে, অপার্থিব জোছনা প্লাবিত ঢেউয়ে আমি ভেসে যাচ্ছি।

লিলিপুর কাছ থেকে শিখে নিলাম, কীভাবে বুকের ধনের মৃত্যুর পর মা হয়ে সবর করতে হয়। নবিজির সবরের হাদিস কীভাবে প্রতিফলিত করতে হয় বাস্তব জীবনে। সেই নারী সাহাবিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা। তার ছোট্ট ছেলে আবু উমাইর ছোটকালেই মারা গেল। বাসায় তিনি একা। ছেলের মৃত্যু শোকে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন না। হা-হুতাশ নেই তার মাঝে। সবর ও ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক যেন। স্বামী বাসায় ফিরবেন। তাকে কীভাবে শান্ত রাখবেন তিনি। কীভাবে সামলে নেবেন সবকিছু। আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইলেন তিনি।

রাত নামল। ঘরে ফিরে এলেন স্বামী। জিজ্ঞেস করলেন ছেলের কথা। উম্মে সুলাইম বললেন, 'সে আগের চেয়ে ভালো আছে।' রাত গভীর হলো। স্বামীর সাথে একান্তে

ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রেমের ঝরনায় অবগাহিত হলেন দুজন। স্বামী এখন প্রফুল্ল, প্রশান্ত। এই সুযোগে উম্মে সুলাইম বললেন, 'আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'একজন আপনার কাছে একটি জিনিস আমানত রেখেছে। কিছুদিন পর তিনি আমানত ফিরিয়ে নিতে এলেন। এখন আপনার কী করণীয়।'

'অবশ্যই আমানত ফিরিয়ে দিতে হবে।'

উম্মে সুলাইম এবার স্বামীর হাত ধরে চাদরে ঢাকা প্রাণহীন ছেলের কাছে নিয়ে এলেন। চাদর সরিয়ে বললেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে এই ছেলেটি আমানত দিয়েছিলেন, আজ সেই আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন। এতে নিশ্চয় আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়?' স্বামী আবু তালহা উম্মে সুলাইমের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন, নারীও এমন বুদ্ধিমতী, সহনশীল হতে পারে! নারীও এভাবে সামলে নিতে পারে পুত্রশোকের কঠিন মুহূর্ত! এদিকে আমিও ভাবছি, আমার আপু কি সেই উম্মে সুলাইমেরই প্রতিচ্ছবি? লিলিপুর দিকে তাকিয়ে ভাবছি, 'উম্মে সুলাইম দেখতে কি এমনই ছিলেন?'

সুখতত্ত্ব

মাহদি হাসান

১.

নাকের সরুপথ বেয়ে একফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল মনির মিয়ার ঠোঁটের দেয়ালে। নোনতা স্বাদের অনুভব পেতেই ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন তিনি। শরীরের দিকে তাকাতেই দেখলেন সারা শরীর ঘামে ভিজে একাকার। ক্লান্তির দিবস শেষে ইট-কংক্রিটের শহরে রাত নেমেছে। চারিদিকে ভ্যাপসা গরম। উত্তপ্ত হয়ে আছে প্রকৃতির দেহ। গাছের ডালপালাগুলো চুল পরিমাণও নড়ছে না। সারাদিন সূর্যের প্রখর তাপের অত্যাচার সহ্য করা মৃত্তিকা ফুসে উঠে জমিয়ে রাখা সকল উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে ধরণির উদরে। প্রকৃতির এ রুক্ষতায় প্রকৃতির কোলে বসবাস করা মানুষগুলো পোহাচ্ছে আগুনে দগ্ধ হওয়া গরমের যন্ত্রণা। মনির মিয়া পাশ ফিরে তাকালেন। দেখলেন, চেহারায় নির্মলতা আর কোমলতা মেখে পাশেই শুয়ে আছে তার আট বছর বয়সি ছেলে মুসা আর তার স্ত্রী রাজিয়া। তাদের চোখের পাতা একটু পর পরই নড়ছে। তীব্র গরমে তাদেরও যে কষ্ট হচ্ছে, চোখের পাতায় ঘুম আসছে না, মনির মিয়াকে তারা তা বুঝতে দিতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ আগে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে এক টুকরো প্রশান্তির ঘুমে মগ্ন ছিলেন মনির মিয়া। তখন হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে মুসা বলে উঠে, 'ও মা! গরমের জ্বালায় আর ঘুমাইতে পারি না। বাজানরে কওনা কালকাই একটা ফ্যান কিন্না নিয়া আসতে।' রাজিয়া ছেলের কণ্ঠ নিচু করতে বলে তাকে সতর্ক করেন।

'আস্তে কথা ক, তোর বাজানের ঘুম ভাইঙা যাইব।'

তারপর ছেলের পাংশু বর্ণ ধারণ করা মুখ দেখে বলেন,

'আনব বাজান আনব, এই কিস্তিটা শেষ হউক। এরপরে তর বাজানে টাকা উঠাইয়া ফ্যান কিন্না লইয়াইব। আর কটা দিন কষ্ট করো বাজান।'

এরপর হাতের পাখা দিয়ে ছেলে আর স্বামীকে বাতাস করতে থাকেন। কিন্তু চোখের পাতা আর এক হয় না। মনির মিয়াকে নড়াচড়া করতে দেখে রাজিয়া ফিসফিস করে তার ছেলেকে বলেন,

'চোখ বন্ধ কইরা থাক। তোর বাজান উঠতে পারে।'

গভীর ঘুমের বিভোর হওয়ার মতো ভান করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে মুসা। রাজিয়া কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন মনির মিয়ার ক্লান্ত, মলিন, শ্রান্ত অবয়বে। মুক্তোর মতো চিকচিক করছে ঘামের ফোঁটাগুলো। রাজিয়ার ইচ্ছে হয় শাড়ির আঁচল দিয়ে সন্তর্পণে ঘামের ফোঁটাগুলো মুছে দিতে। কিন্তু প্রশান্তির পরশ বোলানো ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে বিরত থাকেন। মনির মিয়ার নড়াচড়া দেখে তারপর ঘুমের ভান ধরে শুয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ আগে মা ছেলের কথোপকথন না শুনলেও তাদের কষ্ট ঠিকই অনুভব করতে পারেন মনির মিয়া। এইতো গত বছর বস্তির এই ছোট্ট ঘরটাতে টাকা জমিয়ে ফ্যান কিনে এনে লাগিয়েছিলেন। এক বছর যেতে না যেতেই নষ্ট হয়ে গেল। চেয়েছিলেন পুরোনোটাই আবার ঠিক করবেন। কিন্তু ঠিক করতেই যা টাকা লাগবে তা থেকে নতুন কিনাই ভালো। গত এক মাস ধরে বাড়তি পরিশ্রম করে টাকা জমাচ্ছেন। ঘরে ফিরছেন গভীর রাত করে। তবুও হাতের ফাঁক গলে টাকা শেষ হয়ে যায়। চড়ামূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে হাতে যা থাকে তা নিতান্তই অল্প। হঠাৎ করেই কী ভেবে যেন মনির মিয়ার ঠোঁটে ভেসে উঠে এক চিলতে হাসি। ছেলের মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন,

'কাইলকাই তোগো লাইগা ফ্যান কিন্না লইয়া আসুম। তোগো আর গরমে কষ্ট করা লাগব না। আইজকা বিকালে যেই ব্যাগটা পাইছি হেইডার মইধ্যে নিশ্চয়ই দামি কিছু আছে।'

২.

বাইরে বাতাস নেই একটুও। নেই কোনো পাতারও নড়াচড়া। চাঁদ তবুও বিলিয়ে যাচ্ছে জোছনার আলোক ঝরনাধারা। মনির মিয়া আস্তে করে দরজাটা খুলে বাইরে বের হলেন। আকাশের উঠোনে ছড়িয়ে থাকা থালার মতো রুপালি চাঁদ মাটি স্পর্শ করতে চাইছে। সে আলোয় ঘরের সামনের খালি জায়গাটাতে একটি কাঠের টুকরা পেতে বসলেন। তার সামনে রাখলেন বিকেলে পাওয়া সেই বস্তুটি। একটি ভ্যানিটি ব্যাগ! বিকেল বেলা এক ভদ্রমহিলাকে রিকশায় করে বাসায় দিয়ে আসছিলেন মনির মিয়া।

তখন মহিলাটি ভুলে ভ্যানিটি ব্যাগ তার রিকশায় ফেলে যায়। ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই মনির মিয়া ব্যাগটি দেখতে পান। অমনি তার কুমন্ত্রক আত্মা জাগ্রত হয়ে উঠল। তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, 'ব্যাগটা জলদি লুকিয়ে রাখ ব্যাটা! নিশ্চয়ই দামি কিছু আছে। বড়লোকের ব্যাগ বলে কথা! আর কত গরমে কষ্ট করবি? এটা থেকে যা পাবি সেটা দিয়ে ফ্যান কেনার পরেও আরও অনেক টাকা বাঁচবে। তোর বউ আর ছেলেকে তো গত রোজার ঈদে কিছুই দিতে পারিসনি। আকামলা মরদ কোথাকার। এটা থেকে ওদেরকে পোশাক কিনে দিস।'। মনির মিয়া অর্থাভাবে থাকলেও কখনো লোভ করেননি। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে কুমন্ত্রণায় পড়ে তিনি ব্যাগটা রিকশার যাত্রী সিটের নিচে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখেন। এরপর রিকশা গ্যারেজে জমা দিয়ে বাজারের ব্যাগে ভরে ব্যাগটাকে নিয়ে আসেন ঘর পর্যন্ত।

মনির মিয়া ব্যাগ খুলে দেখলেন তাতে কিছু খুচরো টাকা আছে। বড়জোর ৫০০ হবে। এ দিয়ে আর কী হবে? মনির মিয়ার চেহারায় রাজ্যের কালোমেঘ নেমে এলো। নিরস মনে ব্যাগটা যখন বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন তখনই তার ডানহাতের কনিষ্ঠ আঙুলে একটা কিছুর ছোঁয়া অনুভব করেন। তড়িঘড়ি করে ব্যাগের দ্বিতীয় প্যাকেট খুলে দেখেন এক কোণে পড়ে আছে একটি প্লাস্টিকের কৌটা। কৌটাটি বের করে উপরিভাগ খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে উঠে মনির মিয়ার। কৌটার ভেতরে থাকা বস্তুটার গায়ে জোছনার আলো লেগে এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। মুগ্ধতায় ভরে ওঠে মনির মিয়ার চোখজোড়া। বুঝতে পারেন নিশ্চয়ই এটা দামি কোনো বস্তু। তার চেহারায় ফুটে উঠে বিশাল রকমের বড়লোক হয়ে যাওয়ার মতো অভিব্যক্তি।

৩.

'মা! তুমি এতটা কেয়ারলেস কীভাবে হতে পার? ড্রাইভারকে বললেই তো সে তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসত। রিকশা নিতে গেলে কেন তুমি? এখন কি আর ওই ডায়মন্ডের রিংটা ফেরত পাওয়া যাবে? যা দিনকাল পড়েছে! কেউ রাস্তায় কিছু পেলে নিজের ভেবে লুফে নিতে দেরি করে না'।

সেদিন রিকশায় ভ্যানিটি ব্যাগটা ফেলে আসার পর থেকে কিছুক্ষণ পর পরই বড় মেয়ের মুখনিঃসৃত ঝাঁঝালো বাক্যগুলো শ্রবণ করতে হচ্ছে মনোয়ারা বেগমকে। কৈফিয়তের স্বরে প্রায় প্রতিবারই উত্তর দিচ্ছেন, 'তোরা জানিসই তো গাড়ির ভেতর আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। সেজন্যই তো রিক্সা নিলাম। বুড়ো মানুষ! আগের মতো সবকিছু মনে থাকে না। তোরাই তো ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে আমাকে পাঠালি। আমার মন বলছে রিকশাওয়ালা ব্যাগটা ফেরত দিতে আসবে। আমার লোকটাকে ভালো মনে হয়েছে। আমি তাকে বেশি টাকা দিতে চেয়েছিলাম। সে ঠিক ঠিক ভাড়াটাই রাখল।'

'ওসব ভান করেছে। এ শহরের রিকশাওয়ালাদের আমার হাড়ে হাড়ে চেনা আছে। সব কটা চোর, বদের হাড্ডি। নিশ্চয়ই ডায়মন্ডের আংটিটা পেয়ে এতক্ষণে শহর ছেড়ে পালিয়েছে।' তীব্র ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে কথাগুলো বললেন মনোয়ারা বেগমের বড় মেয়ের জামাই। যেন হরহামেশাই তাকে এমন এক্সপেরিমেন্টের মুখোমুখি হতে হয়।

ওদিকে মনোয়ারা বেগমের নাতনি তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেনা ডায়মন্ডের রিংটার জন্য রাত থেকে কান্না জুড়ে দিয়েছে। সাথে নাওয়া-খাওয়াও ছেড়েছে। ডায়মন্ডের রিং তার চাই-ই চাই। রফিক সাহেব তার নাতনিকে বারবার বুঝিয়ে যাচ্ছেন, 'আহ্ কাঁদে না দাদু ভাই। একটা গেছে তো কি হয়েছে? তোমাকে নতুন আরেকটা এনে দেবো।' তবুও তার কান্নার রেলগাড়ি অবিরাম চলছেই।

ঠিক এমন সময়ে 'সুখের ঠিকানা' ভিলার সকল নাগরিকের মনোযোগ কেড়ে নিলো বাইরের হইচইয়ের আওয়াজ। তারা সবাই তড়িঘড়ি করে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, বাসার মোটা দারোয়ানটা একজন রোগা টাইপের লোকের সাথে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করছে। মনোয়ারা বেগম আঁতকে উঠে বললেন, 'আরে! ওই তো আমার ভ্যানিটি ব্যাগ। আর লোকটাকে দেখে তো কালকের রিকশাওয়ালাই মনে হচ্ছে।' ত্বরিত গতিতে নিচে নেমে এলেন তিনি। বাড়ির অন্য সদস্যরাও তার অনুসরণ করল।

বাড়ির লোকদের দেখে চুপসে গেল দারোয়ান। তার শক্তিমত্তা শূন্যের কোঠায় নেমে এলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মনির মিয়া। বসে বসে খেয়ে শরীর ফুলানো দারোয়ানটার সাথে কুলিয়ে উঠতে তার বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছিল। হ্যাংলা একটা শরীর নিয়ে আর কত পারা যায়? মনোয়ারা বেগম অগ্নিঝরা দৃষ্টি ছুড়ে দিলেন দারোয়ানের দিকে। তার কাঁচুমাচু ভাব আরও বেড়ে গেল। আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা বলতে চেয়েও তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। এরপর মনোয়ারা বেগম রিকশাওয়ালাটির দিকে তাকালেন। কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি কালকের রিকশাওয়ালা না?'

'জি, মেমসাব। আপনি যে কাইল আপনের ব্যাগটা রিকশায় ফালাইয়া গেছিলেন। সেইটাই ফেরত দিতে আসছিলাম। আইসা দারোয়ান ভাইরে কইলাম, ভাইজান এই বাড়ির মালিকের লগে একটু দেখা করুম। উনি কয়, কোনো ছোটলোককে ভেতরে ঢুকতে দেওন যাইব না। পরে হাতে ব্যাগ দেইখা আমার সাথে টানাটানি শুরু কইরা দিছে।'

বিনীত কণ্ঠে মনোয়ারা বেগমের প্রশ্নের উত্তর দিলেন রিকশাওয়ালা মনির মিয়া। বাড়ির সকলে তখন রক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দারোয়ানের দিকে। বেচারা দারোয়ানের 'ধরণি দ্বিধা হও' টাইপ অবস্থা হয়ে গেল। এরপর বাড়ির সকলেই প্রায় সমস্বরে মনির মিয়াকে ভেতরে যেতে বললেন। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিলেন মনির মিয়া। তাদের হাতে

ব্যাগটা দিয়ে বললেন, 'অনেকগুলা সময় লস হইয়া গেল। আর দুই-তিনটা খ্যাপ দিতে পারলে আজকা ফ্যানটা কিনতে পারুম। কিছু মনে করবেন না। আমার অহন যাইতে হইব। জানি ব্যাগটার লাইগা আপনারা অনেক চিন্তায় আছিলেন। আমার কালকাই ফেরত দেওয়া উচিত আছিল। দেরি হইয়া গেল। এর লাইগা আমারে মাফ কইরা দিয়েন।' বাড়ির সমস্ত লোক বিস্ময়ে থ বনে গেল। একটু আগেই যে দারোয়ান মনির মিয়ার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়েছিল, তার চোখেও দেখা গেল সীমাহীন শ্রদ্ধা।

৪.

মনির মিয়া আবারও ছুটে চলছেন। এই ছুটে চলা দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জনের লক্ষ্যে। হাতে কিছু টাকা জমেছে এই কদিন হাড়ভাঙা খাটুনি করে। যে করেই হোক আর কটা টাকা রোজগার করে আজকের মধ্যে ফ্যান না কিনলেই নয়। তবে এত চাপের মাঝেও এই মুহূর্তে নিজেকে বেশ ভারমুক্ত মনে হচ্ছে মনির মিয়ার। মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে মাথার ওপর থেকে বিরাট ভারী একটা বোঝা নামিয়ে দিয়ে এসেছেন। বুকের গভীরে অনুভব করছেন অদ্ভুত প্রশান্তি। শত হিরার মূল্য দিয়েও যা কেনা দুঃসাধ্য। গতকাল রাতে আংটিটা দেখে সাময়িকের জন্য মনে আনন্দের সৃষ্টি হলেও একটুপরই রাজ্যের চিন্তা ভর করে তার মস্তিষ্কে। তিনি ভাবলেন, এমন দামি জিনিসটা যে হারিয়েছে সে নিশ্চয় অনেক কষ্টে আছে। আর এই জিনিসটা বিক্রি করে দিলে তা পাপ হবে। পাপ দিয়ে ক্ষণিকের জন্য সুখ কেনা গেলেও তার বিপরীতে পরবর্তী সময়ে নেমে আসবে অবর্ণনীয় দুঃখ। তা ছাড়া এমন দামি বস্তু যদি কেউ তার হাতে দেখে তাহলে নানা বিপদ হতে পারে। তার ছোট্ট সুখের সংসারে নেমে আসতে পারে দুর্যোগের ঘনঘটা। এসব ভেবে আঁতকে ওঠে মনির মিয়ার পিতৃসুলভ ও স্বামীসুলভ মন। তখনই নিজের অসৎ ইচ্ছার জন্য তওবা করে দৃঢ় সংকল্প করে নেন। কাল ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই তিনি এই দামি বস্তু তার মালিকের হাতে সোপর্দ করে আসবেন।

৫.

মুসার বাপ! আপনের হাতে এইটা কী! দেখতে তো অনেক সুন্দর লাগতাছে। মনে হয় অনেক দামি জিনিস। কই পাইলেন? পেছন থেকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে রাজিয়া। মনির মিয়া তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মৃদুস্বরে ধমক দিলেন, 'তুমি ঘুম থেইকা উইঠা আইছ ক্যান? মুসার ঘুম ভাইঙ্গা যাইব। যাও, ভেতরে যাও।' মনির মিয়া ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। রাজিয়াও দরজা লাগিয়ে চলে আসেন ঘরের ভেতরে। তার চোখে রাজ্যের কৌতূহল। তিনি ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছেন তার স্বামীর হাতের ওই বস্তুটার মধ্যেই রয়েছে তাদের টানাটানির সংসারে সচ্ছলতার উপাদান। মনির মিয়া টিনের বেড়া কেটে তৈরি করা জানালাটা তুলে দেন। তাদের ছোট্ট ঘরটায় ফালি ফালি জোছনার আলো

প্রবেশ করে এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য মনির মিয়া তার স্ত্রীকে বলেন, 'মুসার মা! দেখছ বাইরে কী সুন্দর জোনাকপইরা (জোছনাভরা) রাইত। চান্দের কী ফকফইক্কা (পরিষ্কার) আলো! আরে কই তুমি? দেইখা যাও, কেমুন সুন্দর সিনারি (দৃশ্য)।'

'হ! দেখলাম তো! এই সুন্দর ফকফইক্কা আলোর মইধ্যে আপনের হাতের ওই জিনিসটা কী সুন্দর ঝিলিকমিলিক করতাছিল (চমকাচ্ছিল)! এড়িয়ে যেতে চাওয়া প্রসঙ্গটা আবার উল্লেখ করে রাজিয়া। এরপর আরও অনুনয় করে বলে, 'ও মুসার বাপ! কন না! কই পাইলেন এইডা? মনে হইতাছে অনেক দামি! এইটা বেচলে অনেক টেকা পাওয়া যাইব। আমাগো আর কষ্ট কইরা দিন কাটান লাগব না।' মনির মিয়া জোরে ধমক দিয়ে বললেন, 'এইসব কি কও তুমি? মাইনসের জিনিস বেইচ্চা আমি পাপের ভাগী হইতে পারুম না। মাথার ওপরে আল্লাহ্ সব দেখেন। তিনি কষ্ট দিছেন। একদিন তিনি সুখও দেবেন। এই পাপের কামাই দিয়া আমার ছোট্ট সোনার সংসারে বিপদ ডাইকা আনতে কও? আল্লাহ্ তোমারে মাফ করুক।' স্বামীর এমন ভয়াল রূপ দেখে পিলে চমকে গেল রাজিয়া বেগমের। সাথে সাথে নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন, 'আমি তো এতকিছু ভাইব্বা দেহি নাই। আমার ভুল হইয়া গেছে। আমারে মাফ কইরা দেন।' মনির মিয়ার ধমকের আওয়াজে মুসারও ঘুম ভেঙে যায়। উঠে এসে দাঁড়ায় মা-বাবার পাশে। বাবাকে জাগ্রত দেখে বলতে শুরু করে, 'ও বাজান! ফ্যান কিন্না আনবা কবে? গরমে ঘুমাইতে পারি না।'

'এই তো কালকাই কিন্না আইন্না দিমু। আইজকার রাতটা একটু কষ্ট কর। কালকাই কিন্না আনুম।' স্নেহের স্বরে ছেলেকে নিবৃত্ত করলেন মনির মিয়া। এরপর নিশ্চুপ রাতের কোলে তিনজনকেই দূরাকাশের চন্দ্রালোকে নির্বাক তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। রাতের আঁধার কেটে গিয়ে কোমল ভোরের প্রথম স্নিগ্ধ আলোর ফোঁটা পৃথিবীর গায়ে আছড়ে পড়তেই মনির মিয়া বস্তুটি ফেরত দেওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েন। কিন্তু ঢাকা শহরে অলিগলি ভরা পথে ভদ্র মহিলার বাড়ি খুঁজে বের করতেই সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়। এক টুকরো খাবারও পড়েনি মনির মিয়ার পেটে। ওদিকে দারোয়ানের সাথে টানাহ্যাঁচড়া করে কাহিল শরীরে বেশ ক্লান্তিবোধ হচ্ছে তার। শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি, কোষ যেন বিশ্রাম চাইছে। কিন্তু নিজের অবসন্ন দেহটাকে জোর করে রিকশায় প্যাডেল মেরে চালিয়ে নিচ্ছেন তিনি। চেহারায় তার তীব্র মলিনতা। আজকেও ফ্যান কিনা হবে না। কারণ দিবস শেষে অন্ধকারের উঁকি দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। অথচ তার পকেটে এখনো যোগ হয়নি প্রয়োজনীয় টাকার অঙ্কটা। মনে হয় না আজকে আর পারবেন। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা বেশ ভোগাচ্ছে তাকে। তাই রিকশাটা থামিয়ে রাস্তার পাশে একটি বয়স্ক গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন।

৬.

মনির মিয়া আজও ফ্যান কিনতে পারেননি। যে কয় টাকা পেয়েছেন তার সিংহভাগ মালিককে ভাড়া বাবদ দিতে হয়েছে। হাতে আছে সামান্য কিছু টাকা। তীব্র অপরাধবোধ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথে বাড়ির পথ ধরলেন তিনি। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই তিনি যে বস্তিটাতে থাকেন তার প্রবেশমুখে বিশাল একটা কালো গাড়ি দেখলেন। মনির মিয়া কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে গাড়িটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন দামি গাড়ি বস্তির মতো নোংরা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারলেন না। আরেকটু দূর এগোতেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। পেছন থেকে তাকে কেউ নাম ধরে ডাকছে। বয়স্ক কণ্ঠ থেকে আওয়াজ আসছে, 'কে যায়? মনির মিয়া না? দাঁড়াও।' মনির মিয়া দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলেন গাড়ির ভেতর থেকে দুজন মানুষ বেরিয়ে এলো। চেহারা দেখে মনির মিয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো সেই বাড়ির সাহেব আর সাহেবা! তারা কীভাবে তাকে খুঁজে বের করল? রফিক সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার নাতনিটা তোমার ছবি তুলে রেখেছিল। সেটা দেখিয়েই এ পর্যন্ত এলাম। তোমার নাম দেখছি সবাই জানে।' মনির মিয়া ইতস্তত কণ্ঠে বললেন, 'আপনেরা এত কষ্ট কইরা আমার মতো গরিব মানুষরে খুঁজতে আইছেন? আপনেগো কই বইতে দেই? গরিবের খালি একটা ছোত ঘর আছে।'

রফিক সাহেব বললেন, 'তোমার মতো ভালো মানুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। পৃথিবীর প্রতিটি শহরে যদি তোমার মতো একজন করেও ভালো মানুষ থাকে, তাহলে পৃথিবীর রূপটাই পালটে যাবে। তুমি আমাদের যা উপকার করেছ, তার বিনিময়ে তোমাকে যাই দিই না কেন তা-ই তুচ্ছ হবে। তোমার মধ্যে যে সততার মহৎ গুণ আছে অমন শত শত হিরের আংটি দিয়েও তার মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়।' রফিক সাহেবের এমন উপচেপড়া প্রশংসা শুনে মনির মিয়া তার প্রথমবারের ইচ্ছের জন্য অনেক অনুতপ্ত হলেন। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো তার। রফিক সাহেব আরও বললেন, 'তোমার উপকারের যথাযথ বিনিময় হয়তো আমরা দিতে পারব না। কিন্তু তোমার মতো ভালো মানুষ এমন কষ্টে দিন কাটাবে তা আমরা কীভাবে মেনে নিতে পারি? তাই তোমাকে একটা কাজ দেবো। তোমাকে রাজি হতেই হবে। শহরের অপর প্রান্তে আমাদের আরেকটা বাড়ি আছে। আমরা তাতে বাসা ভাড়া দিই। কিন্তু সেটা দেখভাল করার জন্য বিশ্বস্ত লোক পাচ্ছি না। তাই আমরা চাই তোমাকে সেই বাড়ির কেয়ারটেকার রাখব। তুমি কিন্তু না করতে পারবে না। তোমাকে আর কষ্ট করে রিকশা চালাতে হবে না। মাস শেষে তোমাকে ২০ হাজার টাকা দেবো। চাইলে আরও বেশিও নিতে পারো।'

মনির মিয়া নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভাবতে লাগলেন, মাসে ২০ হাজার টাকা দেবে! তাহলে আর তাদের সংসারে টানাটানি হবে না। এদিকে মনির মিয়ার মৌনতায় চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট হলো রফিক সাহেবের কপালে। তিনি ও তার স্ত্রী প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, কি বলো বাবা, যাবে না? তারা দুজন মনির মিয়ার বাবা-মায়ের সমবয়সিই হবেন। তাদের এমন দরদমাখা আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার সাহস হলো না মনির মিয়ার। তার নেত্রজোড়ায় আনন্দের বারিধারা বর্ষিত হলো। তিনি তাদের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক খণ্ড সম্মতির হাসি ফোটালেন। পৃথিবীর উঠোনে হলো এক মধুরতম দৃশ্যের অবতারণা।

৭.

আকাশের বিশাল সামিয়ানাজুড়ে অগণিত তারার মেলা বসেছে। তারকা-নক্ষত্রের সমাবেশের মধ্যমণি হয়ে ভূপৃষ্ঠে বিপুল আলো ছড়াচ্ছে চতুর্দশী চাঁদ। সে আলোয় মনোমুগ্ধকর সাজে সেজে উঠেছে শহর। শহরের এক টুকরো ভূমিতে দাঁড়িয়ে রাতের মায়াবী মুগ্ধতায় ভাসছে তারা তিনজন। মনির মিয়া, রাজিয়া, আর তাদের ছোট্ট সন্তান মুসা। মনির মিয়া বুকভরে প্রশান্তির নিশ্বাস নিয়ে সহধর্মিণী রাজিয়াকে বললেন, ‘দেখলা মুসার মা! কইছিলাম না! ওই যে আসমান, জমিন, চান, সুরুজ যে বানাইছে উনি সবকিছু দ্যাহে। উনিই কষ্টের পরে সুখ দেয়। একটা কথা মনে রাখবা, পাপে কোনো দিন সুখ আসে না। পাপে বিপদ বাড়ে। আর ভালো কাজের পুরস্কার আল্লাহ্ এই জনমে না দিলেও পরজনমে অবশ্যই দেবেন।’ মনির মিয়া জীবন উপলব্ধ একটি সুখতত্ত্বের সন্ধান দিলেন। রাজিয়া বেগম মনির মিয়ার বুকের পশমে পরম নির্ভরতার আশ্রয় খুঁজে নিলেন। আকাশভরা তারকারাজি, গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ সবাই মিলে সেই পবিত্র দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। পরদিন জুমার নামাজ আদায় করতে গেলেন মনির মিয়া। জুমার বয়ানে শুনতে পেলেন ইমাম সাহেব বলছেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, ‘ইন্না মা'আল উসরি ইয়ুসরা।’ নিশ্চয় কষ্টের পরে সুখ রয়েছে। তাই সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। সাথে সাথে নড়ে উঠল মনির মিয়ার ঠোঁটজোড়া। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ।’

খাদ

আনিকা তুবা

১.

পাহাড়ের ওপর সূর্য ঢলে আসছে। নামাজে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি হচ্ছিল নাবিলা। কিন্তু অজু করতে গিয়েই আবিষ্কার করল আবারও তার নামাজ না-পড়ার দিনগুলো শুরু হয়েছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মনের অজান্তেই।

আট বছর।

আবদুল্লাহর সাথে বিয়ে হয়েছে আট বছর হয়ে গেল। বিয়ের একদম প্রথম থেকেই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সন্তানের জন্য আগ্রহী ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সৌভাগ্যের দেখা মেলেনি। নারীর বুকের মধ্যে প্রবল একটা মাতৃত্ব লুকিয়ে থাকে বলেই হয়তো নাবিলার একটু বেশিই খারাপ লাগে। আবদুল্লাহকে সে কখনোই এতটা মন-খারাপ করতে দেখেনি। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে প্রশ্নটা করেই ফেলে সে।

আচ্ছা, তোমার কি মন খারাপ হয় না?

- কেন? মন খারাপ হবার কী আছে?

এই যে আমাদের এতদিন ধরেও বাচ্চাকাচ্চা হচ্ছে না! ঘর ফাঁকা, উঠোন ফাঁকা, কেমন লাগে এসব?

- খারাপ লাগে না তা না, তবে এতটা খারাপ লাগে না এটাও সত্যি।

হুঁ, পুরুষদের জন্য যেমন উপার্জন, নারীদের জন্য তেমন সন্তান। নিজের মনেই যেন স্বগতোক্তি করে নাবিলা। তোমার ব্যবসা না চললে যেমন চিন্তায় পড়ে যাও, তেমনই বাচ্চা না হলে মেয়েরা খুব চিন্তায় পড়ে যায়।

- চিন্তায় পড়ো ঠিক আছে, কিন্তু তুমি অস্থির হবে না। কতই-বা বয়স তোমার? আল্লাহ চাইলে অবশ্যই বাচ্চা হবে। ধৈর্য ধরো নাবিলা। হতাশ হয়ো না।

নাবিলা হতাশ হয় না। হতাশা এসে তাকে খামচে ধরতে চাইলেও আবদুল্লাহর কথা শুনে শুনে সে-ও শক্ত থাকে। কিন্তু আর কত? তার মনটা যে ভেঙে আসতে চায়। সারাদিন হাসিমুখে সংসারের সবকিছু সামলে চলার পরেও যখন একাকী রবের সামনে দাঁড়াবার সময় হয়, ওমনি পাহাড়ের মতো মজবুত হৃদয়টা ফেটে একটা বোবা কান্না বেরিয়ে আসে। চোখের পানিতে একাকার হয়ে সে খালি হাত তুলে দুআ করে, 'রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া মিন জুররিয়্যাতিনা কুররাতা আইয়ুন। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে নেককার সন্তানসন্ততি দান করো! আমাদেরকে এমন সন্তান দাও যে আমাদের চোখের প্রশান্তি হবে!'

বিয়ে হওয়ারও বহু আগে থেকে নাবিলা এই দুআ করে আসছে। যেদিন সুরা ফুরকানের এই আয়াতটা প্রথম শুনেছিল, দুআটা এত ভালো লেগে গেল যে তখনই মুখস্থ করে ফেলে। এরপর এমন কোনো দিন বোধ হয় পার হয়নি যেদিন সে উত্তম স্বামী আর নেককার সন্তানের কথা ভেবে দুআ করেনি।

তবু আজ মনের ভেতর অনেক মেঘের আনাগোনা। সন্ধ্যার আকাশ গাঢ় হয়ে আসছে। আরও গভীর বিষাদে ছেয়ে আছে তার মন। নাবিলা উঠে দাঁড়াল। জায়নামাজটা বিছিয়ে বসে পড়ল অভ্যাসমাফিক দুআ আর জিকির করার জন্য।

দুজন মানুষের সংসারে কাজ তেমন কিছু নেই। ঘরদোর গুছিয়ে রেখে, রান্নাবাড়া সামলেও অনেক সময় পড়ে থাকে তার। নাবিলা নিয়মমতো ইবাদত আর জিকিরগুলো করার চেষ্টা করে। সপ্তাহে দুইদিন বাসায় তালিমের ব্যবস্থা হয়। একদিন পুরুষদের জন্য, সেখানে ওর স্বামী আবদুল্লাহই সবার খাবার-দাবারের তদারকি করে। আর একদিন নারীদের জন্য, সেদিন নাবিলাদের বাড়িতে আশেপাশের অনেক মেয়েরা এসে জড়ো হয় দ্বীনের গল্প শোনার আশায়। এই এলাকার মেয়েগুলো খুব সহজ-সরল। এদের জীবনে বেশি জটিলতা নেই। অল্প নিয়েই খুশি থাকে। আফগান শহরগুলোতেও এখন কত আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। নাবিলা তার স্বামীর মুখে শুনেছে। কিন্তু শহুরে বাতাস পাহাড় ডিঙিয়ে এখনও এই প্রত্যন্ত গ্রামকে দূষিত করতে পারেনি। আর এখানকার ছেলেবুড়ো কমবেশি সবাই ইসলামের কথা মেনে চলার চেষ্টা করে। তাই জীবন-জীবিকার দৈনন্দিন কষ্টের মধ্যেও কেমন যেন একটা নির্মল প্রশান্তি সবাইকে নির্ভার করে রাখে। রাতে বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই ঘুম। বিপদ দেখলে দশজন লোক হাত বাড়িয়ে দেয়। শহুরে জীবনে এ শান্তির কথা ভাবা যায়? না এই আস্থার সম্পর্ক আছে? সেখানে কত জটিলযন্ত্র, অযাচিত দুশ্চিন্তা, লোকদেখানো ছলনা আর ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতা মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এইসব আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে নাবিলা কখন গভীরঘুমে তলিয়ে গেছে, বুঝতে পারেনি।

২.

ভোরের আলো ফোটার আগেই নাবিলার ঘুম ভেঙে গেল। অদ্ভুত সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে ঘুমের ঘোরে। ফুটফুটে একটা বাচ্চা তার কোলে খেলছে আর খিলখিল করে হাসছে! মনটা দারুণ ফুরফুরে লাগছে! ফজরের আগের স্বপ্নগুলো নাকি সত্যি হয়! তবে কী সত্যি সত্যি সে এবার..? একটা অপার্থিব অনুভবে হারিয়ে যায় নাবিলা। আবদুল্লাহকে ডেকে তোলে, ওঠো, ফজরের নামাজ পড়বে না?

- হুম। তড়িঘড়ি করে উঠে বসে আবদুল্লাহ।

জানো, আমি কী স্বপ্ন দেখেছি? দেখলাম আমাদের একটা বাচ্চা হয়েছে, খুব খুশিমনে আমার কোলে খেলছে।

- বাহ! খুব ভালো স্বপ্ন দেখেছ আলহামদুলিল্লাহ! আমার মনে হয় আল্লাহ শীঘ্রই আমাদেরকে সন্তান দেবেন ইনশাআল্লাহ।

আবদুল্লাহ নামাজের জন্য তৈরি হয়ে মসজিদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। নাবিলাও নিয়মমাফিক মুখ-হাত ধুয়ে এসে জায়নামাজে বসে যায়। নামাজ পড়তে না পারলেও দুআ করতে তো দোষ নেই! মন লাগিয়ে সে আল্লাহর দরবারে দুআ করতে থাকে। ইয়া আল্লাহ, আমার অনাগত সন্তানদের আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। তুমি দ্বীনের খেদমতে ওদের কবুল করে নাও!

বান্দার চোখের পানি কখন কবুল হয়ে যায় রব ছাড়া আর কে জানে! হয়তো সেদিন নাবিলার দুআটা কবুল হয়ে গিয়েছিল। এর ঠিক দু মাস পরেই তার জীবনের এক বিশাল পরীক্ষার অবসান ঘটল।

নাবিলা আবিষ্কার করল তার শরীরের ভেতর আরেকটা নতুন সত্তা! নতুন প্রাণের অস্তিত্বে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সিজদায় পড়ে কাঁদতে লাগল। তার বুকচিরে বারবার শুধু একটাই ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ!

আবদুল্লাহ বাসায় ফিরে সুখবর শুনে উঁচু গলায় তাকবির দিলো। সেই 'আল্লাহু আকবার' এত জোরে শোনা গেল যে আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে মেয়েরা এসে দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করল।

বাবা-মায়ের অসীম খুশির মধ্যে দুনিয়াতে এলো এক নতুন প্রাণ। এমন এক সন্তান যাকে দেখেই মন জুড়িয়ে যায়। আবদুল্লাহ আর নাবিলা নাম ঠিক করলেন। ইসলামের ইতিহাসের এক সাহসী বীর, ঈমানে আর আমলে যার জুড়ি মেলাভার; নবজাতক সন্তানের নাম রাখা হলো সেই সাহাবির নামে। উমর। উমর ইবনে আবদুল্লাহ।

৩.

নাবিলা আর আগের মতো সময় পায় না। আগে আজান দেওয়ার আগেই অজু করে প্রস্তুত হতে শুরু করত। এখন প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়তে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। সুন্নাতগুলো ছুটে যায় প্রায়ই। উমরের দেখাশোনা করতে গিয়ে সংসারের কাজ নিয়েও আজকাল হিমশিম খায় সে। এত দুরন্ত হয়েছে উমর!

চোখের আড়াল হওয়ামাত্র একটা না একটা দুষ্টুমি সে করবেই। হয় তরকারির বাটি উলটে ফেলবে, নয়তো হিসু করে জামা-কাপড়-মেঝে ভেজাবে। একদিন দরজা খুলে হামাগুড়ি দিতে দিতে রাস্তায় চলে গিয়েছিল। আরেকদিন জানালার বাইরে হাত দিয়ে জ্যান্ত শুঁয়োপোকা নিয়ে মুখে দিয়েছে! সারাদিন কি আর বাচ্চার দিকে তাকিয়ে থাকা যায়!

কুরআন পড়তে দেখলেও টানাটানি করে পৃষ্ঠাছেঁড়ার উপক্রম! আর নামাজে দাঁড়ালে তো কথাই নেই। মায়ের পিঠে চড়ে ঘোড়া চালাবে। এত দৌড়াদৌড়ি করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে নাবিলা। তবু ছেলেকে নিয়ে তার ধৈর্যের অন্ত নেই। আবদুল্লাহর ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়। ভোর থেকে শুরু করে নাবিলাই দেখে রাখে ছেলেকে। নাওয়া-খাওয়া, ঘুম পাড়ানো সব এক হাতে। তবুও দেখা যায়, রাতে ঘুম পাড়ানোর সময় সে ছেলে কোলে নিয়ে আপন মনেই গুনগুন করছে, চান্দা হ্যায় তু, মেরে সুরাজ হ্যায় তু, ও মেরে আঁখোকা তারা হ্যায় তু (তুই আমার চাঁদ, তুই আমার সূর্য, ওরে সোনাআমার চোখের তারা-ও যে তুই)!

আবদুল্লাহ অবাক হয়ে দেখে নাবিলা কী সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে তাদের সন্তানকে লালনপালন করছে। মনে মনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানায় আবদুল্লাহ। বাচ্চাকে দেখাশোনার কাজটা তার স্ত্রী একাই কত সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে সে তো কেবল উপার্জনের দিকটা দেখছে।

নিজের দিকটাকে সবসময় সামান্য হিসেবেই দেখত আবদুল্লাহ। অথচ সে যে কী মজবুত দুর্গের মতো চারদিক থেকে আগলে রেখেছিল এই পরিবারটিকে, সেটা নাবিলার চেয়ে ভালো আর কেউ জানত না।

৪.

সতেরো বছর পরের কথা।

উমর এখন টগবগে তরুণ। ভীষণ মুখচোরা কিন্তু স্পষ্টবাদী। ভাবুক আর সাহসী। এমন বিরল গুণের সমাহার খুব একটা দেখা যায় না।

বালেগ হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেউ ওর সতর দেখেনি। ঘুম বাদে কখনও কোনো নামাজ কাজা হয়নি। কোনো মেয়ের সাথে কোনোদিন সে হেসে কথা বলেনি।

যদিও ইদানীং মনের মধ্যে সারাক্ষণই কেমন একটা অস্থিরতা। উমর বোঝে ওর এবার একটা বিয়ে করা প্রয়োজন।

মাদরাসার পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবনাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। হঠাৎ করে বাবার কথা মনে পড়ে যায় উমরের। ওর কাছে বাবার তেমন কোনো স্মৃতি নেই। কেমন ছিলেন তিনি? মায়ের মুখে শুনেছে বাবাও নাকি তার মতোই লম্বা আর মজবুত গড়নের মানুষ ছিলেন। মা আর উমরকে খুব যত্ন করতেন। বাবা যে মাকে কতটা ভালোবাসতেন সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়। আজও মা বাবাকে ভুলতে পারেনি। বেঁচে থাকলে হয়তো তাদের জীবনটা আজ অন্যরকম হতো।

বাবা না থাকায় মা খুব কষ্টের একটা জীবন কাটিয়েছে। নানার বাড়িতে ছিল বেশ কিছু বছর। এরপর উমরকে বড় মাদরাসায় ভর্তি করার সময় হলে আবার এই দরিদাম গ্রামেই চলে আসে। আফগানের এই মাদরাসার নামডাক সবখানে। এখন উমরও পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু কাজ করে। করতেই হয়। মা কারও থেকে হাত পেতে টাকা নেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। উমর তার মায়ের প্রতি ভীষণ মমতা অনুভব করে। কাজ করে গায়ের ঘাম ঝরাতে সে কিছু মনে করে না। বরং ভালোই লাগে।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে মায়ের মুখোমুখি হতেই মা বললেন, হাতমুখ ধুয়ে খেতে আয়। আজ মায়ের মুখটা উজ্জ্বল লাগছে।

- কোনো সুখবর আছে নাকি মা? মা কিছু না বলে খালি রহস্যময়ী ভঙ্গিতে একটু হাসল।

মাকে কিছু বলতে হয় না, উমর মায়ের চেহারা দেখেই অনেক কিছু আঁচ করতে পারে। আজ কোনো বিশেষ কারণে মা খুব খুশি। হয়তো নানাজান চিঠি পাঠিয়েছেন। কিংবা উমরের জন্য ভালো কোনো কাজের সন্ধান পেয়েছে মা। কিন্তু খাবার টেবিলে খুশির কারণটা শুনতেই উমর লজ্জা পেয়ে গেল।

আজ তোর নানা চিঠি পাঠিয়েছে।

- কী লিখেছে নানা?

লিখেছে তোর জন্য একটা ভালো মেয়ের খোঁজ পেয়েছে।

উমরের কানদুটো লাল হয়ে গেল।

মায়ের সাথে তার বেশ বন্ধুর মতো সম্পর্ক। বিয়ে নিয়ে আগেও কথা হয়েছে বহুবার। তবু আজ সত্যি সত্যি কোনো পাত্রীর কথা শুনে কেন যেন কিছুই বলতে পারল না।

মা-ই বলে চলল, মেয়ে দ্বীনদার, হাফেজা, আলেমা। দেখতেও নাকি সুন্দরি। তোর নানা যদি কাউকে পাত্র-পাত্রী হিসাবে পছন্দ করেন, তাহলে আমার মনে হয় আমারও তাকে পছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ্‌। তোর বাবাকেও তোর নানাজান এক দেখায় চিনে বলেছিলেন, এই পাত্র হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

একনাগাড়ে এতকিছু বলে মা দম দিতে থামল। বললেন, তোর আপত্তি না থাকলে আগামী মাসেই মেয়েকে দেখে আসতে পারি। তোর মাদরাসাতেও তো ছুটি আছে।

উমর সংক্ষেপে বলল, হুম চলো। ছেলের আড়ষ্টতায় মা মনে মনে হাসে।

৫.

পাত্রী দেখে খুশিমনে আবার নিজ গ্রামে ফিরে এলো মা আর ছেলে। উমর যেন নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। এখন কাঁধে একজন না, দুজনের দায়িত্ব নিতে হবে। মা ছেলের দায়িত্ববোধ দেখে মনে মনে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানায়।

দেখতে দেখতে বিয়ের সময় চলে এলো প্রায়।

এর মাঝে একদিন খুব হন্তদন্ত হয়ে বাসায় এলো উমর। ভরদুপুরে কাজ ফেলে ছেলের এভাবে বাসায় ফেরা দেখে একটু অবাক হলো নাবিলা। খাবার সময় মা-ছেলের কথোপকথনে জানতে পারল আফগান শহর থেকে নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশি আর্মিরা এসেছে। এই দরিদাম গ্রামসহ আশেপাশের আরও কয়েকটা গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে তারা। তাদের উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট না। কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকটা মেয়ে গুম হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। মাদরাসার ছাত্রদের ধারণা মেয়েগুলোকে খারাপ নিয়তে তুলে নিয়ে গেছে আর্মিরা।

এসব কথায় নাবিলাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কী বলবে, কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। উমর তাকে অভয় দিলো, 'চিন্তা করো না, মা, ইনশাআল্লাহ্‌ সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু কিছুই ঠিক হলো না। গ্রামের পরিবেশ খুব দ্রুতই বদলাতে লাগল। সোভিয়েত সৈন্যরা গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করতে শুরু করেছে। নিরীহ অনেক মানুষকে কোনো কারণ ছাড়াই ধরে নিয়ে গেল। এর মধ্যে যুবতি নারীও আছে। দেখে মনে হচ্ছে আকাশে-বাতাসে একটা ত্রাস সৃষ্টি করাই ওদের উদ্দেশ্য।

৬.

কদিন ধরেই নাবিলা লক্ষ করছে উমরের আচরণে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। অনেক গম্ভীর থাকে। বিয়ের কথা বললেও তার চোখে মুখে সেই চাপা উচ্ছ্বাস আর দেখা যায় না।

সকাল হতে না-হতেই মাদরাসার একটা ছেলে এসে উমরকে ডেকে নিয়ে গেল। দুপুর পেরোল। বিকাল পেরোল। ছেলের বাড়ি ফেরার নাম নেই।

আজকাল নাবিলার মনে বড়ো ভয় হয়। ছেলেটা ঠিকঠাক ফিরবে তো! যা দিনকাল পড়েছে! মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকাও অসম্ভব মনে হয়।

সন্ধ্যা নাগাদ উমর ফিরে এলো। আজ ছেলেকে দেখতে অন্যরকম লাগছে।

উমরই প্রথম মুখ খুলল, ফিসফিস করে বলল, মা, আমরা কিছু অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছি। ইনশাআল্লাহ এবার ওদের গ্রামছাড়া করেই ছাড়ব।

নাবিলা একটু যেন শিউরে ওঠেন। কিন্তু পরমুহূর্তে রবের ওপর অগাধ আস্থা রেখে বলেন, হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয়। আল্লাহ তোদের সহায় হোক! নাবিলার চোখদুটো চিকচিক করে ওঠে। পেটে সন্তান আসার আগে আল্লাহর পথে উৎসর্গের এই দুআই তো করেছিল সে। ভাবতে পারেনি এভাবে কবুল হবে—এত তাড়াতাড়ি।

৭.

আজকাল পাহাড় আর উপত্যকার পথে পথে ঘুরে ঘুরে উমর অনেকটা সময় কাটায়। তার মনে কোনো উদাসীনতা নেই, কোনো প্রেম নেই, কোনো মোহ নেই। ওর জীবনের কেবল একটাই লক্ষ্য—আফগানের এই মাটিকে শত্রুমুক্ত করা। প্রতিদিনই কোনো না কোনো মেয়েকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। পুরুষদের আটক করা হচ্ছে। এসব দেখে দেখে মনে ঘৃণা জমেছে। এই জীবনে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। এ বয়সের একটা ছেলের মনে যে অনুভূতিরা পাখা মেলে, সেসব ডুবে গেছে বহু আগে। শুধু জানে মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে লড়ে যাবে সে। ওপারে গেলেই জান্নাতে ওর বাড়ি আছে ইনশাআল্লাহ। ওর আর কিছুর দরকার নেই।

দরিদামের এ পথগুলোর সাথে ওর বহু বছরের পরিচয়। ছোট্ট থেকে এখানেই তো বড় হয়েছে। এই জ্ঞানটাকে কাজে লাগাতে হবে এখন। পাহাড়ের নিচে একটা গিরিপথ আছে। মারাত্মক খাদ। খবর এসেছে খাদের কাছেই কোথাও সোভিয়েত সৈন্যরা ঘাঁটি পেতেছে। তার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই ঘাঁটি পর্যন্ত একটা নিরাপদ পথ খুঁজে বের করার। তার কাঁধে এখন অনেক কাজ।

ধীরে ধীরে ওদের দলটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। উমরের সাথে মাদরাসার আরও কিছু সহপাঠীও যুক্ত হয়েছে। বিলাল, জায়েদ, হাসান, হুদা, আরও অনেকে। কিন্তু চলাফেরা করতে হচ্ছে অতি সাবধানে। শত্রুসেনারা যদি মুজাহিদ বাহিনীর কথা টের পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে। না, কোনো ভুল করা যাবে না। খুব মনোযোগের সাথে চারদিকটা আবারও পর্যবেক্ষণ করতে থাকে উমর।

আজ থেকে দু-তিন মাস আগেও ওরা মাদরাসার পড়াশোনা, আড্ডা, আর টুকটাক টাকাকামাই করা ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। বড়জোর স্বপ্ন ছিল একটা সুন্দরী মেয়েকে ঘরের বউ করে আনা। এখন স্বপ্নটা কত পালটে গেছে। যে মাটিতে মা-বোনের ইজ্জত নিরাপদ না, সে মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিয়ে ভাবতে লজ্জা হয়। আফসোস, তাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তুলতে কত দেরি হয়ে গেল। তবু আশা এটুকুই যে রোজ হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, ইয়া আল্লাহ, আমরা আপনার জন্য নিজের জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছি।

উমর সে রাতে প্রায় দশ দিন পর বাড়িতে এলো। সাথে আরও কিছু বন্ধুবান্ধব। নাবিলা যত্ন করে রান্না করতে বসে সবার জন্য। ছেলেগুলোর আঙুল চেটেপুটে তৃপ্তি করে খাওয়া দেখলেই বোঝা যায়, অনেকদিন ওদের পেটে ভালো কিছু পড়েনি। ওদের দিকে তাকিয়ে নাবিলা গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোয় যেন।

ভোর হওয়ার আগেই বিদায়ের মুহূর্ত চলে এলো। উমর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলো। নাবিলার গলা ধরে আসছে। ভারী কণ্ঠে বলল, যা বাপ, তোকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম।

ছেলের কপালে আলতো করে চুমু এঁকে দিলো নাবিলা। চোখে একবিন্দুও পানি না এনে বিদায় দেবে সে ছেলেকে। যে মায়ের ছেলে যুদ্ধ করে, সে মা কেন কেঁদেকেটে ছেলের মনকে দুর্বল করবে? নাবিলা ছেলের সামনে আর কখনোই কাঁদবে না। উমর তার বন্ধুদের নিয়ে বের হওয়ামাত্রই নামাজে বসে গেল নাবিলা। আল্লাহর জিকির আর ইবাদত করা ছাড়া এখন আর তার কোনো কাজ নেই।

৮.

আমিরের নির্দেশ চলে এসেছে। উমর আর তার বন্ধুরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত হয়েছে। ওদের মধ্যে দুজন ইচ্ছা করেই শত্রুদের ঘাঁটির কিছুটা দূর থেকে ঘুরে এসেছে। ওদেরকে চোখে পড়ামাত্র শত্রুবাহিনীর একটা দল এগোতে থাকে। সেই দুজন তরতর করে পাহাড়ি পথ বেয়ে গিরিপথ পার হয়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে ধরতে গিয়ে ফাঁদে পা দেয় শত্রুদল। গিরিখাদে আটকা পড়ে তারা। সাহায্যের জন্য পেছন থেকে আরও দুই দল সেনা এগিয়ে আসে। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী আগে থেকে তৈরিই ছিল। তাদের গুলিতে পেছনের দুই দল সামনের দলের সাথে মিলতে ব্যর্থ হয়।

শেষমেশ জান বাঁচাতে কাদার একটা ছোট্ট টিলার পিছে আশ্রয় নেয় তারা। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হলো না। মুজাহিদ বাহিনী পাহাড়ের উঁচুতে অবস্থান করায় সহজেই আক্রমণ চালিয়ে গেল।

শত্রুদের বিশাল বাহিনী। অনেক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু তাদের পক্ষে আল্লাহ নেই। উমর আর তার বন্ধুরা সামান্য কজন মাত্র, হালকা অস্ত্র; বর্ম নেই, ভালো পোশাক নেই, যুদ্ধের বুট নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে। ওরা মরতে ভয় পায় না। আল্লাহর পথে জীবন দেওয়াকেই ওরা সফলতা মনে করে।

আস্তে আস্তে যুদ্ধের রেশ কমে এলো। ২০ এপ্রিল, ১৯৮৫। এই দিনটা ইতিহাসে মুজাহিদদের আনন্দের দিন হিসেবে লেখা থাকবে। শত্রুদলের ক্যাপ্টেনসহ ৩৫ জন সৈন্যকে তারা আজ মারতে পেরেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এ যে বিশাল ব্যাপার! আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুতেই এত বড় অর্জন সম্ভব ছিল না।

কী অদ্ভুতভাবে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত বাহিনী এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে এটা কেউ কল্পনাও করেনি।

বিজয়ের সংবাদ দ্রুতই গ্রামের লোকদের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল।

নাবিলা যুদ্ধজয়ের খবর শোনামাত্র লম্বা করে সিজদা করল! তার আনন্দের অশ্রু নামাজের জমিনকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কতদিন হয়ে গেল ছেলেকে দেখে না! গায়ে একটা লম্বা চাদর পেঁচিয়ে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে। ছুটতে ছুটতে একেবারে পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। উমরের কজন বন্ধুকেও দেখা যাচ্ছে। ক্লান্তি ছাপিয়ে সবার চোখেমুখে একটা খুশির ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে।

উমর কোথায় বাবারা? ওকে একটু ডেকে দাও, আজ অনেকদিন পর ওর হাসি দেখব ইনশাআল্লাহ।

মুহূর্তেই ওদের চেহারা মলিন হয়ে গেল। আনন্দের ঝলকটা আর নেই। কেউ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। একজন মাকে কীভাবে বলবে, তার বুকের ধনটা যে আর নেই?

নাবিলা বলল, 'কী হলো কথা বলছ না কেন?' নাবিলার কণ্ঠে চাপা উৎকণ্ঠা। এখনও কেউ কথা বলার জন্য এগিয়ে আসছে না। অনেকক্ষণ পর একজন ধীরপায়ে এগিয়ে এলো। কাঁপা গলায় বলল, 'খালাম্মা, উমর আর নেই। আজ যুদ্ধ করতে করতেই ও আল্লাহর কাছে চলে গেছে।' একটু পর ধরাধরি করে উমরের দেহটা এনে ওরা তার মায়ের কাছে রাখে। ছেলের অসাড় দেহের কাছে ধপ করে বসে পড়ল নাবিলা। উমরের মাথা জড়িয়ে ধরে কোলের ওপর রাখল। এরপর আপনমনেই কত কথা বলল ছেলের সাথে। কখনও হাসে, কখনও চোখের পানি মোছে। আবার গুনগুন করে গান গায়, চান্দা হ্যায় তু, মেরে সুরাজ হ্যায় তু, ও মেরে আঁখোকা তারা হ্যায় তু। হয়তো তার মনে পড়ে যায় ছোটোবেলায় ছেলেকে কত কসরত করে ঘুম পাড়াতে হতো। ছেলে আজ শান্তির ঘুম ঘুমিয়েছে। ছলছলে চোখেও আবছা দেখতে পায় উমরের মুখে যেন এক চিলতে হাসি লেগে আছে। আল্লাহ ওকে সবুজ পাখির অন্তরে কবুল করে নিক। আমিন।